بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ই মার্চ, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পিতামাতারা অনেক সময় কোন কাজের কারণে সন্তান-সন্ততিদের কঠোরভাবে ভৎর্সনা করে বা খুবই কঠোর হাতে তাদেরকে ধৃত করে। অনেকেই আবার সন্তান-সন্ততির ভুল-ভ্রান্তিকে এতটাই উপেক্ষা করে যে, সন্তানদের মধ্য হতে ভালো-মন্দের পার্থক্য শক্তিই হারিয়ে যায়। এই উভয় প্রকার আচরণই সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত বা শিক্ষার ওপর খুবই বিরূপ প্রভাব ফেলে। অতি কঠোর ব্যবহার, কথায় কথায় বিনা কারণে বা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া বাধা দেয়া বাচ্চাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে আর এ কারণে বয়সের একটি সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর তারা আর বৈধ কথার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। অনুরূপভাবে সকল বিষয়ে বাচ্চাদের পক্ষপাতিত্ব করাও তরবিয়তের ওপর খুবই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে এমন বয়সের সন্তান-সন্ততির ওপর যারা শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করছে। পিতামাতার এই আচরণ বিশেষ করে পিতার এরূপ আচরণ তাদেরকে নষ্ট করে। অতএব এমন বয়সে সন্তান-সন্ততিদের বোঝানোর জন্য যুক্তি এবংপ্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলা উচিত। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন কিনা সন্তানদের ওপর কেবল তাদের সীমিত পরিবেশেরই প্রভাব পড়ছে না বরং পুরো দেশ বরং সারা পৃথিবীর পরিবেশের তাদের ওপর প্রভাব পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে কোথায় নমনীয় হতে হবে, কোথায় কঠোর হতে হবে আর কীভাবে বোঝাতে হবে সে বিষয়টি পিতাদের দৃষ্টিগোচর থাকা চাই। এটি পিতাদের দায়িত্ব, তাই শুধু মায়েদের হাতে এটি ছেড়ে দেবেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত করার রীতি সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। কোন্ কোন্ জিনিস হালাল বা বৈধ আর কোন্ কোন্ জিনিস তৈয়্যব বা পছন্দনীয় তার বিবরণ তুলে ধরছেন তিনি। তিনি (আ.) বলেন, **"স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন যাদের দেখতে আকর্ষণীয় মনে হয়, কোন প্রাণীকে সুরেলা কণ্ঠের বৈশিষ্ট সহকারে সৃষ্টি করেছেন, কোন প্রাণী খাওয়ার জন্য যার মাংস খুবই সুস্বাদু, কোন প্রাণী ঔষধের জন্য যার মাংসে রোগ-ব্যাধি দূর করার বৈশিষ্ট্য থাকে। শুধুমাত্র হালাল বলেই কোন প্রাণী খাওয়া উচিত নয়। কোন প্রাণীর মাংস হয়ত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে না কিন্তু তা বিভিন্ন ফসল এবং মানুষের মাঝে রোগ-জীবাণু সৃষ্টিকারী পোকামাকড় খেয়ে থাকে।"** তাই কোন কোন পাখি হালাল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সেগুলো শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। পাকিস্তানেও এই বিধিনিষেধ রয়েছে, কেননা সেসব পাখি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। তিনি (আ.) বলেন, **"এই পাখির মাংস হয়তো হালাল হবে আর পছন্দনীয়ও হবে কিন্তু তা এই পোকা- মাকড় খাওয়ার কারণে মানব জাতির সার্বজনীন কল্যাণের নিরিখে এর মাংস**

তৈয়্যব থাকবে না বা খাওয়া উচিত হবে না।" নিঃসন্দেহে তা হালাল এবং পছন্দনীয় কিন্তু তাসত্ত্বেও দেখার বিষয় হলো, অধিক কল্যাণ কোথায় নিহিত। ব্যক্তিগত লাভের ওপর মানব জাতির কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত কেননা; এসব প্রাণী খেয়ে ফেললে মানুষ অন্য অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবেই আমাকে এসব কথা শেখানো হয়েছে। শৈশবে একদিন আমি একটি তোতা বা টিয়া পাখি শিকার করে ঘরে নিয়ে আসি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা দেখে বলেন, "মাহমুদ! এর মাংস হারাম বা অবৈধ নয় ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সব প্রাণী খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। কিছু সুন্দর প্রাণীকে তিনি দেখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন কেননা, সেগুলো দেখা চোখের জন্য সিগ্ধতার কারণ। অনেক প্রাণীকে আল্লাহ্ তা'লা সুরেলা কন্ঠ দিয়েছেন যেন তাদের আওয়াজ শুনে শ্রবণেন্দ্রীয় প্রশান্তি বোধ করে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রীয় বা অনুভূতির জন্য নিয়ামতরাজি সৃষ্টি করেছেন। সেসব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে কেবল রসনা ক্ষুধা চরিতার্থ করলেই চলবে না। অর্থাৎ শুধু জিহ্বার স্বাদ মেটানোর জন্য সব প্রাণী হত্যা করে মাংস খাওয়া আবশ্যক নয় বরং এর অন্যান্য উপকারিতাকেও গুরুত্ব দেয়া উচিত। শুধু খাওয়ার স্বাদ নিলেই চলবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে বলেন, দেখ! এই তোতা পাখি কত সুন্দর প্রাণী, গাছের শাখায় বসে থাকা অবস্থায় দর্শকের কাছে একে কতইনা আকর্ষণীয় দেখাবে।

অতএব তরবীয়তের এই সুন্দর রীতি কেবল হৃদয়কেই বিমোহিত করে না বরং খোদার এই নির্দেশকেও হৃদয়ঙ্গম করায় যে, হালাল বা তৈয়্যব বস্তু খাও কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সাবধানতা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা হালাল এবং তৈয়্যবের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তৈয়্যবের সংজ্ঞা বদলে যায়। অতএব যেসব প্রাণী বা পাখি অন্যান্য কল্যাণকর কাজে লাগে বা যা অন্যত্র উপকারি সেগুলোর কতক হালাল বা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া তৈয়্যব নয় বা খাওয়া পছন্দনীয় নয় কেননা; সেগুলোর মাংস খাওয়ার চেয়ে অন্যত্র সেগুলো বেশি উপকারি।

এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কতিপয় ঘটনা উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পৃথিবী থেকে বিদআত বা ধর্মের শাশ্বত শিক্ষার সাথে যে নতুন সংযোজন হয়েছে সেগুলো দূর করা এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা স্পষ্ট করতে এসেছেন। অতএব যেখানে এটি তাঁর মিশন বা উদ্দেশ্য সেখানে তাঁর পবিত্র সত্তা কীভাবে কোন প্রকার বিদআত ছড়ানোর কারণ হতে পারে? নাঊযুবিল্লাহ্। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের ছবি তুলিয়েছেন বা উঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমীপে যখন তাঁর ছবি সম্বলিত একটি কার্ড বা পোস্ট কার্ড উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি বলেন, এর অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। জামাতকে নির্দেশ দেন, কোন কেউ যেন এমন কার্ড ক্রয় না করে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ পরে আর কেউ এমনটি করার ধৃষ্টতা দেখায়নি। কিন্তু আমি দেখেছি আজকাল পুনরায় কোন কোন স্থানে, টুইটার-এ বা হোয়াট্স্ এ্যাপ-এ মানুষ তা ছড়াচ্ছে, পুরোনো কার্ড কোন স্থান থেকে বের করে বা কোন যুগের কার্ড বের করে যা নিজেদের প্রবীনদের কাছ থেকে নিয়ে থাকবে বা কোন পুরোনো বই পুস্তকের দোকান থেকে কেউ ক্রয় করে এমনটি

করছে। এটি একটি ভ্রান্ত রীতি যা বন্ধ হওয়া উচিত। দূর-দুরান্তের লোকেরা বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা যারা মানুষের চেহারা দেখে চিনতে পারে তারা যেন তাঁর ছবি দেখে সত্য সন্ধান করে উদ্দেশ্যে তিনি (আ.) ছবি উঠিয়েছেন । কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, কার্ডে ছবি ছাপিয়ে মানুষ সেটিকে ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কোথাও অবলম্বন না করে বসে বা যখন তাঁর এই আশঙ্কা হলো যে, এরফলে বিদআতের বিস্তার ঘটতে পারে বা এটি যেন বিদাতের কারণ না হয় এ এমানসে তিনি কঠোরভাবে এতে বাধা দেন বা বারণ করেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একথাও বলেন যে, এগুলো নষ্ট করে ফেলা হোক। অতএব কিছু মানুষ যারা ছবির ব্যবসা করে বা ছবিকে ব্যবসার মাধ্যমে হিসেবে নিয়েছে আর চড়া মূল্য গ্রহণ করে তাদের এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। এছাড়া কিছু এমন মানুষও আছে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবিতে রঙিন ইফেক্ট দেয়ার চেষ্টা করে অথচ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন রঙিন ছবি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত রীতি, এথেকে বিরত থাকা উচিত। এছাড়া খলীফাদের ছবিরও অনেক ভ্রান্ত ব্যবহার রয়েছে, তা থেকেও বিরত থাকা উচিত।

একবার এক শূরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সামনে সিনেমা বা চলচ্চিত্র এবং বায়োস্কোপ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হয়। তখন তিনি (রা.) বলেন, এ কথা বলা যে, সিনেমা এবং বায়োস্কোপ এবং ফোনোগ্রাফ নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে অপছন্দনীয় —এমনটি সঠিক নয়। স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফোনোগ্রাফ শুনেছেন এবং এর জন্য তিনি নিজে একটি কবিতা লিখেছেন এবং পড়িয়েছেন। এখানকার হিন্দুদের ডেকে তিনি সেই নযম শুনিয়েছেন। সেই নযমের একটি পঙক্তি হলো,

আওয়াজ আ রহী হ্যয় ইয়ে ফোনোগ্রাফ সে (ফোনোগ্রাফ থেকে এই শব্দ ভেসে আসছে)

ঢুন্ডো খুদা কো দিল সে না লাফ ও গুযাফ সে (খোদা তা'লাকে কেবল বুলি বা দাবি সর্বস্ব নয় বরং আন্তরিকভাবে সন্ধান কর)।

অতএব সিনেমা বা চলচ্চিত্র নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয়। অনেকে প্রশ্ন করে, সেখানে যাওয়া অর্থাৎ সিনেমায় যাওয়া পাপ নয় তো? এটি নিজে বা নিজ বৈশিষ্ট্যে অপছন্দনীয় নয় বরং এ যুগে এর যে বিভিন্ন রূপ আছে সেগুলো চরিত্র নষ্ট করে। কোন চলচ্চিত্র যা সম্পূর্ণরূপে তবলীগি এবং শিক্ষামূলক, তাতে তামাশা বা নাটকীয়তার যদি কোন দিক না থাকে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মতামত হলো, তবলীগের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবৈধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামনেও এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, যারা বলে, কোন সময় যদি এমটিএ'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মিউজিক অন্তর্ভুক্ত করা হয় বা ভয়েস অব ইসলাম যে রেডিও চ্যানেল আরম্ভ হয়েছে তাতেও মিউজিক অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই! এসব কথা এবং এসব নতুন সংযোজনকে নির্মূল করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। তাঁর (আ.) যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে আমাদের চিন্তাধারার প্রবাহ তার অনুকূলে প্রবাহিত হওয়া উচিত। নিত্য নতুন আবিষ্কারাদির ব্যবহার অবৈধ নয় আর এটি বিদআতও নয় কিন্তু এসবের অন্যায় ব্যবহারই এসবকে বিদআতে পর্যবসিত করে। অনেকে এই প্রস্তাবও দেয়

যে, তবলীগি এবং তরবিয়তী অনুষ্ঠান সমূহ যদি নাটকের মত করে সাজানো হয় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, আপনারা যদি কোন অন্যায় এবং ভ্রান্ত কাজে প্রবেশ করেন বা অনুষ্ঠান মালায় যদি কোন অন্যায় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে কিছুকাল পর শত প্রকার বিদআত আপনাআপনি অনুষ্ঠান মালায় অনুপ্রবেশ করবে। অ-আহমদীদের দৃষ্টিতে হয়তো কুরআন শরীফও মিউজিকের সাথে পড়া বৈধ হতে পারে কিন্তু একজন আহমদীকে বিদআত বা নতুন কথা সংযোজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। তাই আমাদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত এবং এগুলোকে এড়িয়ে চলার অনেক বেশি চেষ্টা করা উচিত।

একজন অ-আহমদী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছে যা একটি চুটকি বা কৌতুকও বটে আর মৌলভী সাহেবের অজ্ঞতাও এর মাধ্যমে প্রকাশ পায় আর একই সাথে এদের চিন্তাধারার স্বরূপও স্পষ্ট হয়। এরা এসব বিষয়কেও বৈধ মনে করে। লেখক লিখছে, এক জায়গায় এক আরব গায়িকা আরবী গান গাইছিল। সেই মৌলভী সাহেবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি খুবই তিনি মত্ত হয়ে তা শুনছিলেন আর একই সাথে সুবহানাল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবরও পড়ে যাচ্ছিলেন। একজন তাকে জিজ্ঞেস করে, মৌলভী সাহেব! আপনি এত দুলছেন কেন বা আন্দোলিত কেন? তিনি বলেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, সে কত সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পড়ছে? সেই গান যেহেতু আরবী ভাষায় ছিল তাই তিনি তা কুরআন মনে করে বসেছেন। অতএব বিদআতের প্রসার ঘটলে এভাবে মানুষের চিন্তাধারারও বিকৃতি ঘটে।

এক জায়গায় ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করার সময় মনে করে, আমাদের রোগীদের চিকিৎসার কাজ আমরাই সারতে পারি, অন্য কাউকে দেখানোর প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে এমনটি হয়ে থাকে আর তারা মনে করে, কারো কোন পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, উপমহাদেশীয় ডাক্তারদের শতকরা ৯৯% এমন যারা অন্যের সাথে পরামর্শ করাকে অসম্মানের কারণ মনে করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ সাহেব, যিনি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অন্য সব এ্যাসিস্টেন্ট সার্জনদের চেয়ে উত্তম কিন্তু তাসত্ত্বেও এর অর্থ এটি নয় যে, তার পরামর্শ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও এই রীতিই ছিল আর আমারও একই রীতি। ১৯১৮ সনে যখন আমি অসুস্থ হই তখন ডাক্তার এবং কবিরাজদের একত্রিত করি, ডাক্তারদের ঔষুধও খেতাম আর কবিরাজদেরও কেননা জানা নেই যে, কার দ্বারা আমরা উপকৃত হব। কোন ডাক্তার নিজেকে খোদা মনে করলে করতে পারে কিন্তু আমরা তাকে মানুষই মনে করি। আজকালও কোন কোন ডাক্তার অন্যের চিকিৎসা নিলে রাগ করে। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি।

অনেক সময় সাধারণ গুল্মলতা দ্বারা ভেষজ চিকিৎসা যারা করে তারা রীতিমত কবিরাজও হয় না কিন্তু তাদের হাতে কিছু ব্যবস্থাপত্র আসে আর তা দিয়ে তারা মানুষের চিকিৎসা করে এবং

রোগীর খুবই উন্নত চিকিৎসা করে থাকে। যেখানে অনেক সময় ডাক্তাররাও ব্যর্থ হয়ে যায় আর কোন চিকিৎসা যেখানে কাজে আসে না সেখানে তাদের এই চিকিৎসা, এই গুল্মলতা বা কবিরাজি ঔষধ কাজে লাগে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সৈয়্যদ আহমদ নূর কাবলী সাহেবের নাকে ক্ষত ছিল। তিনি অনেক জায়গায় চিকিৎসা করিয়েছেন, লাহোরের মিউ হাসপাতালেও গিয়েছেন, এক্সরে করিয়ে কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেন? কিন্তু ক্ষত ক্রমশঃ দুরারোগ্য হয়ে উঠে। অবশেষে তিনি পেশওয়ার যান এবং সেখানে একজন নাপিতের চিকিৎসা গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তি শুধু তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করে আর এতেই ক্ষত সেরে যায়। তিনি (রা.) বলেন, এমন দক্ষ এবং কুশলীরা রয়েছে যারা এমন এমন বিষয় জানেন যে, এগুলোকে যদি ধরে রাখা যায় বা জীবিত রাখা যায় বা তাদের উৎসাহিত করা হয় তাহলে এসব থেকে অনেক নতুন পেশার উদ্ভব ঘটতে পারে। জীবিত রাখার অর্থ হলো, এ সম্পর্কে গবেষণা করা, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে তাদের উচিত এই ব্যবস্থাপত্র পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে চলমান রাখা। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে যা হয় তাহলো যারা এর জ্ঞান রাখে তারা এসবকে চলমান রাখার চেষ্টা করে না বা অন্যকে জানানো পছন্দ করে না, তাই তারা উন্নতিও করে না। এদিকে যদি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে এসব থেকে আরও অনেক নিত্য নতুন জ্ঞানের শাখার উন্মেষ ঘটতে পারে। তিনি (রা.) বলেন, যেমন হাড়ের চিকিৎসাকে নিন। পাহলোয়ান এবং নাপিত হাড় ঠিক করতে পারে। এরফলে পুরোনো ব্যাথা এবং হাড়ের বাঁক দূর করা যেতে পারে। অনেকেই দক্ষ সাজে আর ভালো হাড়ও ভেঙ্গে ফেলে কিন্তু অনেকেই আছে যারা এ বিষয়ে খুবই দক্ষ। অতএব এই জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানের তা বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, অতীতে মানুষ এসব পেশা বা এসব জ্ঞান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে খুবই কার্পণ্য করতো আর কেউ কাউকে বলতো না, এ কারণেই কালের প্রবাহে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকের বহু প্রাচীন চিকিৎসা বা বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র জানা ছিল কিন্তু তারা কাউকে তা বলতো না তাই কালের প্রবাহে তা বিলুপ্তির শিকার হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা এমন করে না, তারা তাদের জ্ঞানের প্রসার করে। আর এরফলে তাদের আয়-উপার্জনও বেশি হয়। কিছু ঔষধে প্যাটেন্ট থেকে থাকে অর্থাৎ কিছু কোম্পানির নিজস্ব সত্ত্ব থেকে থাকে। কিছুদিন পর তারা সেই সত্ত্ব প্রত্যাহার করে নেয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক নাপিত ছিল যে এমন মলম প্রস্তুত করতে জানতো যা ব্যবহারে অনেক বড় বড় পুরোনো ক্ষত, দুরারোগ্য ক্ষত ভাল হয়ে যেত। মানুষ দূর-দুরান্ত থেকে তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসতো। তার ছেলে তার কাছে ব্যবস্থাপত্রের কথা জানতে চাইলে সে বলতো, এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তি পৃথিবীতে দু'জন হওয়া উচিত নয়। অতএব এটি আমার কাছে আছে, এখানেই থাকবে। সে নিজের ছেলেকেও তা বলেনি। অবশেষে সে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার পুত্র তাকে বলে, এখন তো আমাকে জানিয়ে দিন কেননা; জীবনের কোন ভরসা নেই। সে বলে, ঠিক আছে তুমি যদি মনে কর যে, আমি মারা যাচ্ছি তাহলে আস তোমাকে বলছি। কিন্তু এরপর হঠাৎ করে বলে, আমি হয়তো সুস্থ হয়ে উঠব বা আমি আরোগ্যও লাভ করতে পারি তাই সে আর ছেলেকে বলে নি। এর কয়েক ঘন্টা পরই সে

ইহধাম ত্যাগ করে। তার ছেলের আর জানা হলো না এবং সেই বিদ্যা সম্পর্কে বিশ্ব অজ্ঞই থেকে গেল। তার ধারণা ছিল, আমি চিকিৎসা সম্পর্কে অবগত হব কিন্তু পিতার হঠকারিতার কারণে বেচারা অজ্ঞই থেকে গেল। তার পিতাও তার কোন কাজে আসেনি আর তার জ্ঞানও তার কোন কাজে আসলো না। তিনি বলেন, কার্পণ্য উন্নতির নয় বরং লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার কারণ হয়। তাই এমন বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা উচিত নয়। জ্ঞানের প্রসার এবং বিস্তারের চেষ্টা থাকা চাই। তিনি বলেন, অনেক সময় এটি (অর্থাৎ এই কার্পণ্য) বংশের ধ্বংস ডেকে আনে। তাই এসব পেশা বা চিকিৎসাবিদ্যা এবং উপজীব্য সম্পর্কে শেখানো কল্যাণকর হয়ে থাকে, এরফলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আমি মনে করি হারিয়ে যাওয়া এসব উপজীব্য বা প্রফেশন সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণা হওয়া উচিত। অতএব ডাক্তাররা কোন কোন ক্ষেত্রে অহংকারের কারণ হয় বা অহংকার করে আর এই অহংকারের কারণে তারা অন্যের জন্য দুঃখ-কষ্টে ডেকে আনে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা জ্ঞানের অবসান ঘটায় আর পৃথিবী একটি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতএব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে এটি একটি সাধারণ বা সার্বজনীন সমস্যা। আহমদীয়া জামাতকে সেসব দেশে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন এই অজ্ঞতা দুরীভূত করা সম্ভব হয়।

মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকে আর সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। আবার অনেকেই হয়ে থাকে ত্বরাপরায়ণ। দুরভিসন্ধি না থাকলেও তারা আপত্তি করে বসে বা এমনভাবে কথা বলে যাতে আপত্তির দিক থাকে। এমন লোকদের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে একবার এমনই ভিন্ন প্রকৃতির দু'ব্যক্তি এক জায়গায় একত্রিত হয়। ১৯০৫ সনের ৪ঠা এপ্রিলের ভয়াবহ ভূমিকম্পের প্রাককালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভূমিকম্প সম্পর্কে বহু ইলহাম হয়। ইলহাম হয় যে, ভূমিকম্প আসবে। তিনি খোদার বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে বাগানে আশ্রয় নেন। কতক নির্বোধ তখনও বলে বসতো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সে যুগে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব হয়েছিল আর ভূমিকম্পও হচ্ছিল। তারা বলে, তিনি প্লেগের ভয়ে বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হলো, কতিপয় আহমদীর মুখেও আমি এ কথা শুনেছি অথচ প্লেগের ভয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কখনও তাঁর ঘর ছাড়েন নি। তখন যেহেতু ভূমিকম্প সম্পর্কে তাঁর প্রতি উপর্যুপরি ইলহাম হচ্ছিল তাই তিনি কিছুদিন বাগানে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন আর অন্যান্য বন্ধুদেরও সেখানে আশ্রয় নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সময় যেহেতু স্বল্প ছিল তাই কিছু মানুষের ব্যবস্থা তাঁবুতে করা হয়, আর কিছু মানুষ ইটের ওপর চাটাই বিছিয়ে ঝুপড়ি বানিয়ে নেয় এভাবে তিনি সবাইকে সাথে রাখেন।

অতএব ত্বরাপরায়ণ প্রকৃতির মানুষ অনেক সময় চিন্তা ভাবনা না করেই আপত্তিকর কথা বলে বসে। এমনটি থেকে বন্ধুদের দূরে থাকা উচিত। খুতবা ইলহামীয়া চলাকালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যেভাবে দেখেছেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তিনি (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা আরবী ভাষায় ঈদের খুতবা প্রদানের নির্দেশ দেন আর

তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দেয়া হবে। তিনি ইতোপূর্বে কখনও আরবী ভাষায় বক্তৃতা করেন নি। কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আসেন আর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে, তাঁর চেহারায় এতটাই দৃষ্টিনন্দন ও জ্যোতির্মন্ডিত অবস্থা বিরাজ করছিল যে, আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো বক্তৃতা শুনি অথচ বয়স কম হওয়ার কারণে আরবীর একটি শব্দও আমার বোধগম্য ছিল না।

খুতবা ইলহামীয়াতে মসীহ্ মওউদের যে বিজ্ঞাপন রয়েছে তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় না যে, মসজিদে মুবারক কোনটি –অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদকে মানুষ এই প্রশ্ন করে। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খুতবা ইলহামীয়া আনিয়ে সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করেন আর বুঝান যে, এ স্থলে এই মসজিদের কথাই বুঝানো হয়েছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং নির্মাণ করিয়েছেন আর এরপর তিনি নিম্ন লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীন অসুস্থ হয়ে পড়েন, প্রায় ৪০ দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই মসজিদ সম্পর্কে একটি ইলহাম রয়েছে, প্রকৃত ইলহামটি এ ধরনের, **"মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারিকিন ইয়ুজআলু ফিহ"** । তিনি (আ.) বলেন, এটি যেহেতু এ মসজিদ সংক্রান্ত ইলহাম, তাই চল এই মসজিদে গিয়ে তোমাকে ঔষধ দেই। হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে বা আম্মাজানকে হযরত মসীহ্ মওউদ মসজিদে গিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর প্রস্তাব করেন, মসজিদে এসে ঔষধ খাওয়ান আর দু'ঘন্টার মধ্যেই হযরত উম্মুল মু'মিনীন সুস্থ হয়ে উঠেন।

ডাক্তারদের ধর্মসেবার দায়িত্ব পালন করা উচিত, এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা থাকা উচিত– এ মর্মে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, অসুস্থ এবং রুগ্ন লোকদের ওপর সত্যের প্রভাব খুব দ্রুত পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একজন ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন, আমি ধর্মের কী সেবা করতে পারি, ধর্মের কোন্ খিদমত করব? তিনি (আ.) বলেন, আপনি রোগীদের তবলীগ করুন। অসুস্থ লোকদের হৃদয় যেহেতু খুবই কোমল হয়ে থাকে তাই এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

অতএব, বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মন-মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত। আর এ কথা মেনে চললে জাগতিক আয়-উপার্জনের পাশাপাশি ধর্ম সেবার সুযোগও পাবে আর খোদার কৃপাভাজনও হবে।

আজকাল নারী অধিকারের নামে বা সন্ত্রাসকে নির্মূল করার নামে বা অকারণে ইসলামের ওপর আপত্তি করার মানসে প্রাশ্চাত্যে পর্দার প্রশ্নটি খুবই জোরালো ভাবে উঠানো হয়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে কোন পরিস্থিতিতে কেমন পর্দা করা উচিত এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক তুলে ধরেছেন । কুরআনে নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়া সম্পর্কে (আল্লাহ্) বলেন, **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (সূরা আন্ নূর: ৩২) অর্থাৎ 'যেই সৌন্দর্য আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর এ প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যে তফসীর রয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** - এর অর্থ হল দেহের সেই অংশ যা আপনা-আপনিই প্রকাশ পায় অর্থাৎ যা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে গোপন রাখা সম্ভব হয় না।

সেই বাধ্যবাধকতা গঠনগত হোক অর্থাৎ দৈহিক গঠনের সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। যেমন মানুষের উচ্চতা এক প্রকার সৌন্দর্য যা গোপন করা অসম্ভব। তাই তা প্রকাশে শরীয়ত বারণ করে না বা রোগ-ব্যাধির দৃষ্টিকোণ থেকেও হতে পারে। চিকিৎসার জন্য শরীরের কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ডাক্তারকে যদি দেখাতে হয় তাও কুরআনের শিক্ষা অনুসারে দেখানো বৈধ, বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ পর্যন্তও বলতেন, ডাক্তার কোন মহিলা রোগীর ব্যবস্থাপত্র হিসেবে যদি প্রস্তাব করে যে সে যেন মুখ না ঢাকে। যদি চেহারা আবৃত করে তাহলে তার স্বাস্থ্য হানী ঘটতে পারে। আর ডাক্তার তাকে এদিক সেদিক বা বাইরে ঘোরা-ফেরারও নির্দেশ দিতে পারে। ডাক্তার রোগীকে বলতে পারে যে তুমি যদি মেনে না চল তাহলে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে সেই মহিলার মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করা বৈধ হবে বরং কোন কোন ফিকাহ্বিদদের মতে যদি কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হন আর ভালো মহিলা দাঈ পাওয়া না যায় আর ডাক্তার বলে দক্ষ দাঈ না রাখলে জীবন হুমকিগ্রস্ত হতে এমন মহিলা যদি প্রসবের সময় কোন পুরুষ দাঈ এর সাহায্য নেয়, এটিও বৈধ বরং কোন মহিলা পুরুষ ডাক্তারের সাহায্য না নিয়ে প্রসবের সময় যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহ্র দরবারে সে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মতই পাপী গণ্য হবে। এমন বাধ্যবাধকতা কাজের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পূর্বে উদাহরণ দিয়েছেন এবং তার প্রতিই ইঙ্গিত করছেন যে, যেমন আমি কৃষিজীবি পরিবারের মহিলাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তারা যদি কাজ না করে বা কাজে যদি পুরুষদের সাহায্য না করে তাহলে তাদের জীবিকাই নির্বাহ হতে পারে না। এসব কিছুই إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا -এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব ইসলাম স্বাধীনতাও নিশ্চিত করেছে আবার বিধি-নিষেধও আরোপ করেছে, লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে পর্দা শিথিল করার বা পর্দার মান কিছুটা শিথিল করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু একই সাথে অকারণে, অবৈধভাবে ইসলামী নির্দেশকে লঙ্ঘন করতে বারণ করেছে, স্বাধীনতার নামে ইসলামে নির্লজ্জতার কোন অনুমতি নেই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় জ্ঞান এবং বুৎপত্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মুসলেহ্ মওউদ (আ.) বলেন, ইসলামী মাসলা-মাসায়েলের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা এবং ধর্মীয় বিষয়ে প্রণিধানের। এগুলোর ভেতর গভীর প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এসব না বুঝবে আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন হয়ে ভ্রষ্টতার শিকার হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার কোন বৈঠকে বলেন, মানুষ যদি তাক্বওয়ার দাবি সমূহ মেনে চলে তাহলে সে শত বিয়ে করতে পারে। এই কথাটি জামাতের একটি পত্রিকায় ছেপে যায় এরপর কানাঘুষা আরম্ভ হয় যে মনে হয় যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো,বিয়ে চারটিই করতে হবে এমন কোন বিধিনিষেধ নেই। পুরুষরা একথা শুনে হয়তো খুবই আনন্দিত হবেন, কেউ যত ইচ্ছা বা যতটা চায় বিয়ে করতে পারে চারটির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার কোন বিধিনিষেধ নেই। মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব (রা.) এই বিতর্ক এবং বিতণ্ডা যা বাইরে চলছিল মসীহ্ মওউদের কর্ণগোচর করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনার একথা বলার পিছনে উদ্দেশ্য কি ছিল? মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার কথা অর্থ হলো যদি এক স্ত্রী মারা যায় বা কোন কারণে যদি তালাক

দিতে হয় মানুষ তার স্থলেও আরেকটি বিয়ে করতে পারে, এভাবে একশত বিয়েও করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডন করেন যা কতেক ধর্ম উপস্থাপন করে। এই কথাটি অন্য প্রেক্ষাপটে হচ্ছিল। কেউ কেউ বলে, হুযূর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, প্রসঙ্গ না দেখেই মতামত ব্যক্ত করে। কোন কোন ধর্ম অনুসারে সারা জীবন মানুষের দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিত নয়! স্ত্রী মারা যাক বা তালাকই হোক না কেন, বিশেষ করে যখন স্ত্রী মারা যায় তখন আর দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করেন আর এই প্রেক্ষাপটেই কথা হচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তি যদি ব্যাখ্যা ছাড়াই থেকে যেত তাহলে কিছুকাল পর এটিই মনে করা হত যে, যত চাও বিয়ে কর আর এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, একমাত্র শর্ত হল তাক্বওয়ার। আজকাল পুরুষরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে, তাক্বওয়ার শর্ত তারা জলাঞ্জলি দেয়, তাক্বওয়ার শর্ত দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। এ সম্পর্কে মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে দীর্ঘকাল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিশ্বাস এমনটিই ছিল যে, চারের অধিক বিয়ে করা বৈধ। সে সময় জামাত যেহেতু ছোট ছিল আর সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে বন্ধুদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ থাকত। এমন বিষয় নিয়ে অনেক দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা হত। সে যুগে কোন একটি সময় এ বিষয়টি অআলোচনায় আসে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, চার স্ত্রী সংক্রান্ত বা চার বিয়ে সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শরীয়ত থেকে প্রমাণিত নয়। আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়েত তিনি উপস্থাপন করেন, যাতে লেখা ছিল হযরত ইমাম হাসানের ১৮ বা ১৯টি বিয়ে হয়েছে। সেই বৈঠকে কেউ বলে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি এটি নয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ধরে নেন যে, হয়তো তাঁর সামনে বিষয়টির পুরো চিত্র উপস্থাপন করা হয়নি, তাই তিনি কাউকে বলেন, এই বইটি নিয়ে যাও, ইমাম হোসাইন সংক্রান্ত আবু দাউদের এই যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখাও। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যিনি বই নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদের কাছে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আর তিনি গভীর উৎসাহে বগলে বইটি নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কী? তিনি বলেন, হযরত মৌলভী সাহেব এই উদ্ধৃতিটি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ (রা.) মওউদ বলেন, তার উৎসাহ, তার আগ্রহ দেখে আমিও সেখানেই উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আসলে বিষয়টিও এমনই। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যাওয়ার সময় খুবই হাস্যোৎফুল ছিলেন কিন্তু ফিরে আসার সময় মাথা নিচু করে মনমরা অবস্থায় ফিরে আসেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার? তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন এটি কোথায় লেখা আছে যে, তাঁর সব স্ত্রীরা একই সময়েই ছিলেন? অতএব বিষয়ের এখানে সুরাহা হয়ে গেল যে চারের অধিক বিয়ে এক সাথে করা যেতে পারে না আর তাও শর্ত সাপেক্ষে আর তাক্বওয়া হল সবচেয়ে বড় শর্ত।

ইমামের ডাকে সাড়া দেয়া সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইমামের ডাকের মোকাবিলায় ব্যক্তির আওয়াজ-এর কোন গুরুত্বই নেই, যখনই তোমাদের কানে আল্লাহ্‌র রসূলের আওয়াজ আসে তাৎক্ষণিকভাবে লাব্বায়েক বলা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ছুটা কেননা; এতেই তোমাদের উন্নতির রহস্য নিহিত বরং মানুষ তখন নামাযে রত থাকলেও তার জন্য আবশ্যক হবে নামায ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের ডাকে সাড়া দেয়া। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের জামাতে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার এমনই করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ডাক শুনে তাৎক্ষণিকভাবে নামায ছেড়ে দিয়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হন। খুব সম্ভব মীর মেহদী হাসান সাহেব বা মিঞা আব্দুল্লাহ্ সানোরী সাহেবও এমনটিই করেছেন। এই দু'জন ভিন্ন ভিন্ন যুগে এমনটি করেছেন। কেউ কেউ এ সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই আয়াত পাঠ করেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (সূরা আন্ নূর: ৬৪) তোমরা রসূলের ডাকাকে তোমাদের একে অপরকে ডাকার ন্যায় মনে করো না। *বা একথা ভেবো না যে ডেকেছেন ঠিকই কিন্তু সাড়া দেয়া বা নেয়া দেয়া আমাদের ব্যপার।* তোমাদের মাঝে যারা দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে সরে পড়ে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জানেন। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন ভয় করে, পাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন বিপদ তাদেরকে স্পর্শ না করে বা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের তারা শিকার হয়।

অনুরূপভাবে অন্যত্র এসেছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (সূরা আল্ আন্‌ফাল: ২৫) অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান করে।

নবীর ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বরং ঈমানের লক্ষণাবলীর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। এসব পুণ্যবানরা বা বুযূর্গগণ যা করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে বৈধ ছিল। নবীর উপস্থিতিতে নামায বা অন্য কোন পুণ্য মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং সব সময় আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা। যার দৃষ্টান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনে আমরা দেখতে পাই। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনেও তা চোখে পরে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার প্রতি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এটি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর আজও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (রা.) বলেন, মু'মিন সত্যিকার অর্থে খুব বেশি বুঝানো বা অনুপ্রেরণার জন্য অপেক্ষা করেন না, তার জন্য ইশারা এবং ইঙ্গিতই যথেষ্ট হয়ে থাকে আর ইঙ্গিত বুঝে সে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যে, অনেকেই তাদের উন্মাদ বলে সন্দেহ করে। এ জন্য পৃথিবীতে যত মু'মিন অতিবাহিত হয়েছে তাদেরকে মানুষ উন্মাদই আখ্যা দিয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, আমার একজন শিক্ষক ছিলেন, তার নাম ছিল মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ; আল্লাহ্

মাগফেরাত করুন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, তাঁর এমন মানষিক দুর্বলতা ছিল বা দুর্বলতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তিনি তাঁর প্রেমাষ্পদ এবং নিজেকে তাঁর প্রেমিক জ্ঞান করতেন। সেই প্রেমের আতিশয্যে তিনি মনে করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁকে প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ্ মওউদ বানিয়ে দিয়েছেন। মসীহ্ মওউদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা বা প্রেম ছিল তাঁর ধারণা ছিল, তিনিই প্রতিশ্রুত পুত্র এবং মুসলেহ মওউদ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি ছিল কথা বলতে বলতে অনেক সময় আবেগের বসে উরুতে সেভাবে হাত মারতেন যা দেখে মনে হত কাউকে ডাকছেন। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবেই আবেগাপ্লুত কণ্ঠে কিছু বলছিলেন, মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ সাহেব ছুটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে গিয়ে বসে পড়েন, পরে কেউ জিজ্ঞেস করে, আপনি এটি কি করলেন? তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই যে ইঙ্গিত করেছেন সেটি আমার প্রতি ছিল যে, তুমি এগিয়ে আস তাই আমি ছুটে যাই। এই ছিল এক প্রকার উন্মাদনা কিন্তু কোন কোন উন্মাদনা শুভ হয়ে থাকে ।তার এই উন্মাদনা বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়নি বরং ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে। অতএব পাগলপর প্রেমিক যে ইঙ্গিত তার প্রতি না করা হয় সেটি সম্পর্কেও ধরে নেয় যে, আমার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি (রা.) এই প্রেক্ষাপটে নসীহত করেন আর জামাতের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসার দাবি করে তারা সঠিক ইঙ্গিত এবং ইশারা কেন বুঝবে না যা তাদের প্রতি করা হয়েছে। আমাদের জামাতের উন্মাদদের জামাতের প্রতি যে ভালোবাসা রয়েছে তা মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদের মতও কি নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর উরুতে আস্তে করে হাত মারেন আর এতেই তিনি ধরে নেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ডাকছেন অথচ এখানে আল্লাহ্ তা'লা অতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন, তার মসীহ্ বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন অথচ আমরা মনোযোগ দেই না। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত আর আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কতটা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং তাঁর ইশারা-ইঙ্গিতকে বুঝি এবং অনুধাবন করি।

সব কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, তাঁর নির্দেশের অধীনে থেকে করা উচিত। মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। তিনি (রা.) বলেন, মৌলভী গোলাম আলী সাহেব এক কট্টর ওয়াহাবী ছিলেন। ওয়াহাবীদের ফতওয়া ছিল, ভারতে জুমুআর নামায বৈধ, হানাফিদের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। সে যুগে অদ্ভুদ সব দৃষ্টিভঙ্গি রাখত মানুষ। তারা বলতো, মুসলমান বাদশাহ্ থাকলেই সেখানে জুমুআ পড়া বৈধ হবে। আর জুমুআ যিনি পড়াবেন তিনি মুসলমান কাজী হবেন। যেখানে জুমুআ পড়া হবে তা শহর হওয়া চাই। ভারতে ইংরেজ শাসনের কারণে মুসলমান বাদশাহও ছিল আর কাজীও ছিল না, তাই তারা জুমুআর নামায পড়া বৈধ মনে করত না— এই ছিল তাদের সমস্যা। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে তারা লেখা দেখত, যখন জুমুআর জন্য ডাকা হয় তাৎক্ষণিকভাবে সব কাজ ছেড়ে দিয়ে জুমুআর জন্য ধাবিত হও। এ কারণে তাদের মনে শান্তি ছিল না । একদিকে মন জুমুআ পড়ার বাসনা রাখতো। অপর দিকে আশঙ্কা ছিল, কোথাও কোন

হানাফি মৌলভী না আবার আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করে বসে। এই উভয় সঙ্কটের কারণে তাদের রীতি ছিল জুমুআর দিন গ্রামে প্রথমে জুমুআ পড়তো এরপর যোহর নামায পড়ে নিত আর মনে করতো, জুমুআ সংক্রান্ত মাসলা যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা নিরাপদ আর যোহর নামায পড়া সংক্রান্ত মাসলা যদি বৈধ হয় তাহলেও আমরা নিরাপদ। এ কারণে তারা যোহরের নামাযের নাম যোহরের পরিবর্তে 'এহতিয়াতি' রাখত অর্থাৎ সাবধানতাসূচক নামায। আর মনে করত, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদের জুমুআর নামাযকে ফেলে দেন তাহলে আমরা যোহরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করব আর যদি যোহর প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে জুমুআকে রেখে দেব। কেউ 'এহতিয়াতি' না পড়লে অর্থাৎ যোহর না পড়লে তাকে ওয়াহাবী মনে করা হত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমরা মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে গুরুদাসপুর যাই। পথিমধ্যে জুমুআর সময় হয়ে যায়, আমরা নামায পড়ার জন্য একটি মসজিদে যাই। তার সাধারণ রীতির মিল ছিল ওয়াহাবীদের রীতি-নীতির সাথে, ওয়াহাবীরা হাদীস অনুসারে আমল করা আবশ্যক জ্ঞান করত। তাদের বিশ্বাস হল, মানুষের মুক্তির জন্য মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ আবশ্যক। বস্তুতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মৌলভী গোলাম আলী সাহেবের সাথে যান আর জুমুআর নামায পড়েন। মৌলভী গোলাম আলী সাহেব জুমুআর নামায শেষ করার পর যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়ে নেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! জুমুআর নামাযের পর চার রাকাত নামায কোত্থেকে এল? তিনি বলেন, এটি 'এহতিয়াতি' অর্থাৎ সাবধানতাসূচক যোহর পড়লাম, আমি বললাম, মৌলভী সাহেব আপনিতো ওয়াহাবী আর বিশ্বাসগতভাবে আপনি এর বিরোধী। 'এহতিয়াতি'র অর্থ কি? তিনি বলেন, 'এহতিয়াতি' এই অর্থে নয় যে, আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জুমুআ গৃহীত হয় না-কি যোহর বরং এটি এই অর্থে যে, মানুষ যেন আমাদের বিরোধিতা না করে— ভয় মানুষের খোদার নয়। সুতরাং অনেকেই মানুষের ভয়ে এমন কাজ করে যেমনটি গোলাম আলী সাহেব করেছে। জুমুআ পড়ছেন বলে তিনি মনে মনে আত্মপ্রসাদ নিলেও মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যোহরের চার রাকাত নামাযও পড়েন।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক বৈঠকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষ দাঁড়ি কামিয়ে ফেলে। তিনি (আ.) বলেন, **আসল বিষয় হল খোদাপ্রেম। এদের হৃদয়ে যখন খোদার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, নিজ থেকেই এরা আমাদের অনুকরণ আরম্ভ করবে।**

আমরা প্রকৃত অর্থে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা অনুধাবন করব আর সত্যিকার খোদাপ্রেম আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবে আর আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্ম খোদা তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী হবে—খোদা করুন যেন এমনটিই হয়।

নামাযের পর এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি জনাব আব্দুন নূর জাবী সাহেবের। যিনি সিরিয়া নিবাসী। তিনি ১৯৮৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তাকে সরকারী বাহিনী গ্রেফতার করে। পুরো জীবন বৃত্যান্ত এখানে নেই, আমার সামনে যা লেখা আছে সে অনুসারে কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি করেছেন। ২০১৩

সনে ৩১ ডিসেম্বর সরকারী আমলারা তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কারণ হল, কেউ তার মোবাইল ফোন ধার করে বিদ্রোহীদের ফোন করে। এটি সিরিয়ার পরিস্থিতি যখন খারাপ হওয়া আরম্ভ হয় সে যুগের কথা, তখন কাউকে ফোন ধার দেয়া আপত্তিকর কোন ব্যাপার ছিল না। যাহোক, বিদ্রোহীদের কেউ তার ফোন নিয়ে সাথী সঙ্গীদের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত কথা বলে। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা ফোনে আঁড়ি পাতে, চেক করে এবং তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, তার ফোন থেকেই ফোন করা হয়েছে। ধরে নেয়া হয়, বিদ্রোহীদের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। এ কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যা করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট অনুসারে মরহুম গ্রেফতার হওয়ার তৃতীয় দিনে মাথায় মারাত্মক আঘাতের কারণে ইন্তেকাল করেন। সরকারী পুলিশ চরম নির্যাতন করে ।বিদ্রোহী এবং সরকারী বাহিনীর অবস্থা অভিন্ন। কিন্তু তার পরিবার তার মৃত্যুর সংবাদ পায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

ইনি সালিমুল জাবী সাহেবের পৌত্র ছিলেন। সালিমুল জাবী সাহেব একজন প্রবীণ আহমদী। সালিমুল জাবী সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদের যুগে রাবওয়াও গিয়েছেন, উর্দূ ভাষা খুব ভালো জানেন। মরহুম পরিচিত শ্রেণীর মাঝে এবং নিজের পরিবেশে খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, ভদ্র ও কোমলমতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কোন কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। স্বাস্থ্যবান এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তার বোন মোহতরমা হেবাতুর রহমান জাবী সাহেবা বলেন, আমার ভাইয়ের জন্মের পূর্বেই মা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তাঁর ছেলে হয়েছে, তাঁকে বলা হয়েছে, আপনি নূর প্রসব করেছেন। পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে)-এর পক্ষ থেকে তার নামা রাখা হয়েছে আব্দুন নূর। তিনি বলেন, আমার ভাই খুবই অনুগত ও মেধাবী ছিল। সবাই তার মেধা এবং যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করত। তার সাথে আমার শেষ যে কথা হয়েছে তাতে তিনি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বলেন, যদি আমি সত্যবাদী আহমদী হই তাহলে আমাকে অন্যদের ক্ষমা করতে শেখা উচিত। যাহোক, খোদা তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবার, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং দাদাসহ জীবিত সবাইকে ধৈর্য দান করুন। সিরিয়ার পরিস্থিতির জন্য দোয়া করা উচিত। সেখানে সরকারের যুলুম এবং নির্যাতনের কারণেই বিদ্রোহী শক্তি মাথাচারা দিয়েছে। আর উভয় পক্ষই যুলুম এবং নির্যাতনে সীমালঙ্ঘন করছে। তৃতীয় শ্রেণী হল, দায়েশ যারা ইসলামের নামে যুলুম এবং নির্যাতনের বাজার গরম করছে। সেখানে বসবাসকারী যত ভদ্র মানুষ রয়েছে তারা সরকারের হাত থেকেও নিরাপদ নয়, সরকারও একইভাবে অত্যাচারী আর বিদ্রোহী শ্রেণীও একইভাবে যুলুম এবং অত্যাচার করছে। আর ইসলামের নামে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যারা দাবিকারক তারাও একইভাবে যুলুম এবং নির্যাতন করছে আর নিরিহ সাধারণ মানুষ এই যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে আর সেসব আহমদীও যারা কোন দলের অংশ নয়। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন, এদেশের প্রতি করুণা করুন আর যালেম এবং অত্যাচারীদের হাত থেকে এই দেশকে সত্বর পরিত্রাণ দিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।